সূচি

প্রকাশকের কথা [পাঁচ]
ভূমিকা [নয়-বত্রিশ]

পারিবারিক প্রবন্ধ ১
প্রাসঙ্গিক তথ্য ১১২

সামাজিক প্রবন্ধ ১২৩
প্রাসঙ্গিক তথ্য ২৮২

আচার প্রবন্ধ ২৯৭
শব্দার্থ ৪১৩

বিবিধ প্রবন্ধ : প্রথম ভাগ ৪১৭

বিবিধ প্রবন্ধ : দ্বিতীয় ভাগ ৪৮৯
প্রাসঙ্গিক তথ্য ৫৯৬

গ্রন্থ পরিচয় ৬০৫

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও রচনাবলি ৬৪০

শিরোনাম-সূচি ৬৪২

Scanned with OKEN Scanner

ভূ মি কা

অবতারণা

সমাজ কী? কেই বা সামাজিক? এক সময় সমাজ বলতে সজাতীয় লোকজন বোঝাত, অনেক সময় গ্রামের লোকসমূহ, যারা নিজেদের মধ্যে পরিচিত, এই সমষ্টিকেই সমাজ আখ্যা দেওয়া হত। শরৎচন্দ্র তাঁর *পল্লী সমাজ* উপন্যাসে এইরকম সমাজের কথাই বলেছেন। তিনি যখন লিখেছেন 'বেণী প্রভৃতির হাত-ধরা পল্লী-সমাজ সত্য চাহে নাই',[১] তখন তিনি যে-সমাজের কথা বলছেন সেখানে মানুষ পরস্পরের পরিচিত, সন্নিহিত, এই সমাজ মানুষের মুখোমুখি সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত। এখানে তাই সামাজিক বলতে সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি, নিয়মকানুনের প্রতি কুশলতা বোঝায়। এই উপন্যাসে যখন জ্যাঠাইমা বলেন, 'সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেছে, তাকে জবরদস্তি ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য করতে হবে';[২] অথবা অন্য প্রসঙ্গে যখন বলেন, 'আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সেদিন তার বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা করে দিলে, কিন্তু সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে।'[৩] তখন আমরা এই মুখোমুখি সমাজ ও তার সামাজিকতার কথা বুঝি। পশ্চিমেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে 'সোসাইটি' কথাটি মানুষের অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ সম্মিলনী-র অর্থেই ব্যবহৃত হত।[৪] আধুনিক বিমূর্ত অর্থে সমাজ শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তখন থেকে সমাজ কথাটি এক বিশেষ 'সামাজিক বিন্যাস' বোঝাতে থাকে। এই পরিবর্তনের একটি মূল কারণ ছিল পশ্চিমে জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান, যখন সমাজের একটি মাত্র প্রচলিত ধারণাই রাষ্ট্রের স্তরবিন্যাস ও আধিপত্যমূলক নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠানগুলি সূচিত করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আলোড়নের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বুর্জোয়া রাজনৈতিক বিন্যাস সংগঠিত করতে গিয়েই সমাজ এক সর্বজনীন ও বিমূর্ত অর্থে গঠিত হয়। সমাজ-এর এই অর্থ নাগরিক সমাজ ও সামাজিক চুক্তির ধারণার সঙ্গে জড়িত, এবং এর থেকে উদ্ভূতও বটে।

এই যে বিমূর্ত সমাজের ধারণা, যে-সমাজে আমাদের অবস্থান নৈর্ব্যক্তিক, যে-সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পর্কহীন, এর সঙ্গে মুখোমুখি সমাজের যে প্রসঙ্গ দিয়ে এই আলোচনা শুরু করেছি, তার একটা বড় তফাত আছে। আধুনিক সমাজের অর্থ আজকে যা হয়ে উঠেছে, তা হল এক ওজনদার একীভূত সমষ্টি, এবং ভূদেব পশ্চিমের সমাজ সম্পর্কে তাঁর নানাবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও সমাজের এই ধারণাটাই মেনে নিয়েছেন। পশ্চিমে সমাজের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে তার সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে। এই সমাজে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবন রাজনৈতিক জীবন থেকে ভিন্ন হয়ে যায়, রাজনৈতিক জীবনও চার্চ থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে, গৃহ-পরিবারকে আবার এসবের থেকে আলাদা হিসেবে দেখা হতে থাকে। জীবনের এই বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম ভাবা হতে থাকে যে 'সমাজ' এই চতুর্বর্গ নিয়েই গঠিত, এই চারটি প্রতিষ্ঠান যেন স্বাভাবিকভাবেই সমাজের অঙ্গ। তাই সমাজতত্ত্বে সমাজকে বুঝতে গেলে তার অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম এবং আত্মীয়সম্পর্ককে বুঝতে হবে। যা পশ্চিমের ক্ষেত্রেই শুধু নরমাটিভ ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সমাজের সাধারণ সংজ্ঞায় পরিণত হল। *সামাজিক প্রবন্ধে* ভূদেব পশ্চিমের সমাজ যে উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছে, তার প্রভূত সমালোচনা করেছেন, কিন্তু মূল সমাজের ধারণাটিকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। বরং তাঁর মনে হয়েছে পশ্চিমের প্রসূত উপাদানগুলির পরিবর্তে ভারতের

Scanned with OKEN Scanner

ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপাদানগুলি যদি সমাজে প্রতিস্থাপন করা যায়, তাহলে সে সমাজ আমাদের উপযোগী হবে, সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। ভূদেবের এই অবস্থান নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা পরবর্তী অংশে এসব নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু তার আগে ভূদেব ও তার প্রকাশিত বইগুলি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রেক্ষাপট

ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ যখন কলকাতার ৩৭নং হরিতকীবাগান লেনে থাকতেন তখন ভূদেবের জন্ম হয়। প্রচলিত 'সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী' ও 'ভূদেব চরিত' মতে তাঁর জন্ম তারিখ ৩রা ফাল্গুন ১২৩১ (১৭৪৬ শক) (ইংরেজি ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮২৫), কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ভূদেবের কোষ্ঠী অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ হবে ১১ই ফাল্গুন ১৭৪৮ শক (ইংরেজি ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮২৭)।[৫] প্রথমে কয়েকটি ভিন্ন স্কুলে পড়বার পর, তেরো বছর বয়সে তিনি হিন্দুকলেজ জুনিয়র স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই শ্রেণীতে তিনি মধুসূদন দত্তকে সহপাঠীরূপে পেয়েছিলেন। মোট ছ-বছর পাঁচ মাস তিনি হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন, ১৮৪৫ সালে তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। চাকরি জীবনে প্রথমে তিনি হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, পরে তিনি ১৮৪৭ সালে চন্দননগরে নিজেই চন্দননগর সেমিনারি নামে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁকে আবার চাকরির অন্বেষণ করতে হয়, এবার তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজির দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। এরপর তিনি সরকারি শিক্ষা-বিভাগের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন, নিজের যোগ্যতাবলে স্কুল পরিদর্শকের সর্বোচ্চ পদ পেয়েছিলেন। ১৮৮৩ সালে চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৫ই মে ১৮৯৪ সালে। তিনি পনেরোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৮৯৫), *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৯০৪), *ক্ষেত্রতত্ত্ব* (১৮৬২), *পুষ্পাঞ্জলি* (১৮৭৬) প্রভৃতি। এছাড়া শিক্ষা বিষয়ক দুটি বাংলা সাময়িকপত্র, *শিক্ষাদর্পণ* ও *সংবাদসার* এবং *এডুকেশন গেজেট* ও *সাপ্তাহিক বার্তাবহ*[৭] তিনি পরিচালনা করেছেন বহুবছর। এডুকেশন গেজেটেই তাঁর *পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ* গ্রন্থগুলিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধের অধিকাংশ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

ভূদেবের যে গ্রন্থগুলি নিয়ে এই রচনাসংগ্রহ তাদের প্রকাশনার কালক্রমিক ইতিহাস এইরকম : *পারিবারিক প্রবন্ধ*, ১২৮৮ সাল (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮২); *সামাজিক প্রবন্ধ*, ১২৯৯ সালে (সেপ্টেম্বর ১৮৯২); *আচার প্রবন্ধ*, ১৩০১ সালে (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫); এই পুস্তকের মুদ্রণ ভূদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শেষ হয়; *বিবিধ প্রবন্ধ*, প্রথম ভাগ, ১৩০২ সালে (১ জুন ১৮৯৫); *বিবিধ প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩১১ সাল (১৩ এপ্রিল ১৯০৫)। ভূদেব প্রথমে *পারিবারিক প্রবন্ধ* প্রকাশ করেন, সেখান থেকেই তাঁর *সামাজিক প্রবন্ধ* লেখার সূত্রপাত। ভূদেব বলেছেন— 'আমি পারিবারিক প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে অনেকস্থলেই সামাজিক প্রভাবের উল্লেখ করিয়াছি, বিশেষত, 'ধর্মচর্চ্চা' এবং 'সন্তানের শিক্ষা' এই দুইটি প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে সমাজকেই প্রধানতম উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। 'পারিবারিক প্রবন্ধই আমাকে 'সামাজিক প্রবন্ধ'গুলির বিরচনে প্রবৃত্ত করিতেছে।'[৮] *সামাজিক প্রবন্ধ* প্রকাশ করার আগে ভূদেব বেশ কয়েকজনের মতামত নেন, এঁদের মধ্যে অক্ষয় সরকারও ছিলেন। তিনি ভূদেবকে পুস্তকখানি প্রকাশ করতে বিশেষ অনুরোধ করেন। পুস্তকটি প্রকাশিত হয় চুঁচুড়ার বুধোদয় যন্ত্রে। কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর ভূদেব এক বছর আট মাস জীবিত ছিলেন।

Scanned with OKEN Scanner

সামাজিক প্রবন্ধ

সামাজিক প্রবন্ধ বইটির বিষয় ভূদেব নিজেই 'গ্রন্থের আভাস' অংশে বলেছেন। বইটি মূলত দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন স্বদেশী সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জাতীয়ভাবের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করা যায় কি না। তিনি বিচার করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে জাতীয়ভাব গ্রহণ করার পথ আমাদের কাছে রুদ্ধ নয়। এর সমর্থনের জন্য তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইয়োরোপে প্রচলিত কয়েকটি সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতে ইংরেজ আগমনের ফলাফল বিচার করেছেন এবং পঞ্চম অধ্যায়ে পরবর্তী ফল কী হতে পারে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করেছেন। মাঝে, চতুর্থ অধ্যায়ে, ভারতীয় এবং ইংরেজদের সম্বন্ধ ঠিক কীরকম এবং এই যোগাযোগের পরিণাম কী হতে পারে, সেটা বিচার করেছেন। পরিশেষে, দেশের উন্নতির জন্য, জাতীয়ভাবের সংরক্ষণের জন্য, দেশবাসীর কর্তব্য কী তাই আলোচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে তিনি কোনো 'সর্বদেশসাধারণ সমাজতত্ত্বের' গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন না, এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কোনো আন্দোলনের সহযোগিতা করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। মূল কারণ হল ইংরেজ এদেশে আসার ফলে এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে অনেকেই আমাদের নিজের ধর্ম, সমাজ, পারিবারিক ব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠান এই সব বিষয়েই অজ্ঞ হয়ে পড়েছেন। ভূদেবের এই গ্রন্থ রচনা করার উদ্দেশ্য হল যাতে দেশবাসী প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কর্তব্য নির্ণয় করতে পারে।

জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্য হল তা দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, সংরক্ষণের কথা বলে। এর প্রধান কারণ হল বিদেশি শাসন, শিক্ষা, অর্থনীতির প্রভাবে এমন এক শঙ্কা উদ্ভূত হয় যে আমরা বোধহয় আমাদের যা-কিছু নিজস্ব, আমাদের স্বকীয়তা, বিশিষ্টতা, মৌলিকতা, এই সব কিছুই হারাতে চলেছি। কীভাবে এর পুনরুদ্ধার সম্ভব? কীভাবেই বা একে বাঁচিয়ে রাখা যাবে? ভূদেব তাই এই গ্রন্থে নব্যশিক্ষিত হিন্দুদের জন্য আর্য হিন্দুত্বের মহত্ত্ব তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন। ভূদেবের জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তিনি লিখেছেন : 'আমার সমস্ত কামনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, কেবল আমার দেশের লোক সত্য সনাতন ধর্মের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভাল লোক হয়, এ সাধ এখনও ছাড়িতে পারি নাই।'[৯] তাই ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে কীভাবে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন, সংরক্ষণ ও প্রসার করা যায়, কীভাবে ইংরেজ অধিকারের মধ্যে থেকেও দেশবাসী জাতীয় আদর্শের অনুগামী হতে পারে, এই গ্রন্থে ভূদেব সেটাই আলোচনা করেছেন। ভূদেব এই হিন্দু-আদর্শকে এক যুক্তির কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, এ হিন্দুত্ব যেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাবিধানে পরীক্ষিত; এরকমই এক হিন্দুত্বের আদর্শ পাঠকের কাছে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন। তাঁর অন্য দুটি গ্রন্থ, *পারিবারিক প্রবন্ধ* ও *আচার প্রবন্ধ* হিন্দুসমাজের জন্য রচিত, তফাত হল *সামাজিক প্রবন্ধে* তিনি হিন্দুসমাজের বহির্মহলের কথা বলেছেন এবং অন্যদুটি গ্রন্থে তিনি হিন্দুসমাজের অন্দরমহলের কথা বলেছেন, এখানে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম বাঙালি হিন্দু গৃহস্থের যেভাবে বোঝা উচিত ও পালন করা উচিত সেটা ব্যাখ্যা করেছেন। বাঙালি কীভাবে তার গৃহ পরিচালনা করবে, হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী নিত্যনৈমিত্তিক আচার-অনুষ্ঠান করবে, এককথায় হিন্দু সমাজের অন্দরমহল কীভাবে সুরক্ষিত হবে, সেটা সুনিশ্চিত করাই ভূদেবের উদ্দেশ্য।

আগেই বলেছি, ভূদেব *সামাজিক প্রবন্ধ* আরম্ভ করেছেন জাতীয় ভাবের প্রসঙ্গ দিয়ে। এই জাতীয় ভাবের উপাদান কী? ভূদেব বলেছেন নানাবিধ সাদৃশ্যের উপলব্ধি এবং তার ফলস্বরূপ এক বিশেষ সহানুভূতি হল জাতীয় ভাব। জাতীয় ভাবের অর্থ হল জাতিগত এমন একটি ভাব, যা নিজের সমাজ, জাতির প্রতি মানুষকে সমাজবন্ধনে আবদ্ধ করে। এই জাতীয় ভাবের প্রসার ও বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজ শাসন এবং তাদের অধীনে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন সর্বতোভাবে এক হয়ে উঠেছে বলে। ইংরেজ দ্বারা প্রচলিত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ, প্রভৃতি

Scanned with OKEN Scanner

ভারতবাসীকে অনেক কাছে নিয়ে এসেছে, 'এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাশা, এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে,' [সা: ১৩২] ভূদেব আরও মনে করেন যে সামাজিক রীতিনীতি, আচারপ্রণালী এই সবই ভারতবর্ষের সর্বত্র সমপ্রকৃতির, ভারতবর্ষের যেখানেই যাওয়া যাক, সর্বত্রই বাড়িঘরের ধরন, খাওয়াদাওয়া, ক্রিয়াকলাপের রীতিপদ্ধতি মোটামুটি এক। ফলে জাতীয় ভাব গ্রহণের প্রকৃত অধিকারীর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় ভাব গ্রহণের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম যে কোনো বাধা হয়ে উঠতে পারে না, এটা ভূদেব বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন মুসলমান, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা জাতীয় ভাবের আদর্শেই পুষ্ট। জাতীয় ভাব সৃজনের এক প্রধান উপাদান হল ইতিহাস, অথচ বিদেশিরা বলেন ভারতের কোনো ইতিহাস নেই, ফলে জাতীয় ভাব সৃষ্টি হবে কী করে? ভূদেব এই মত খণ্ডন করেন এই বলে যে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি 'গ্রীক বা ইয়োরোপীয়দিগের ইতিহাসের অনুরূপে রচিত নয় বলিয়া ভারতবাসীর ইতিহাস নাই, একথাও অসঙ্গত। সুতরাং ঐতিহাসিক গ্রন্থ না থাকিলে যে জাতীয় ভাবের অসদ্ভাব বুঝায় সে কথা ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না' [সা: ১৪১] তাঁর মত হল প্রত্যেক জাতির ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লেখা হয়। একটি জাতির ইতিহাস তার জাতীয় প্রকৃতির দর্পণ। ভারতবর্ষেরও ইতিহাস আছে, পুরাণগুলি হল ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কাব্য।

জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিকরা জাতি গঠনের ভিত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে যে বন্ধনগুলির কথা বলেছেন, তা হল, ইতিহাস বা অতীতের স্মৃতি, সকলে যার অংশীদার, সামগ্রিকভাবে গভীর সাংস্কৃতিক যোগসূত্র, এবং এমন একটি বোধ যে জাতির সদস্য একটি নাগরিক সমাজের অংশ। জাতীয়তাবাদের আধুনিক ঐতিহাসিক বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন আরও যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তা হল, জাতি এক কল্পিত কমিউনিটি, ইম্যাজিন্ড কমিউনিটি, এই কমিউনিটির গঠন সম্ভব হয়েছে মুদ্রণ ধনতন্ত্রের (প্রিন্ট ক্যাপিটালিজ্‌ম) প্রচারের ফলে। মুদ্রণশিল্প, সংবাদপত্র, উপন্যাস ও অন্যান্য বইপত্র প্রকাশের ফলে, এইগুলির মাধ্যমে যে মানুষরা নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তারাও কাছাকাছি আসার সুযোগ পেল, মুদ্রণ ধনতন্ত্র এইভাবে এক কমিউনিটি সৃষ্টি করল, যা বাস্তবে কাল্পনিক।[১১] এইভাবে পুঁজিবাদ ও মুদ্রণশিল্প একযোগে এক কাল্পনিক কমিউনিটির সম্ভাবনা সৃস্টি করে, যা আধুনিক জাতির ভিত্তি গড়ে দেয়। জাতীয়তাবাদের এই ধারণা উপনিবেশে শিক্ষিত মানুষ পায় ইয়োরোপ থেকেই, কারণ তাঁরা দ্বিভাষী ছিলেন এবং ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি, রাজনীতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। অন্যকথায় অ্যান্ডারসন বলছেন উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ সম্ভব হয়েছিল ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক ও ইনটেলেক্‌চুয়াল ইতিহাসকে অবলম্বন করেই। এই কারণেই এই জাতীয়তাবাদের ধারণাকে কেউ কেউ বলেছেন 'ডিরাইভেটিভ ডিসকোর্স', অর্থাৎ এই ডিসকোর্সের উৎস রয়ে গেছে উপনিবেশবাদীদের রাজনৈতিক-দার্শনিক তত্ত্বে, শিল্পে-সাহিত্যে। অ্যান্ডারসনের মডেলের সঙ্গে পুরোনো দিনে উপনিবেশে জাতীয়তাবাদের যে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাখ্যা পাওয়া যেত, তার মিল আছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অনেকেই দাবি করতেন যে ভারতবাসী স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণাগুলি ইংরেজি বই থেকেই পেয়েছে। অন্যদিকে আমাদের দেশের আধুনিক জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিকরা অ্যান্ডারসনের এই মডেলকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ এবং ইয়োরোপীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক জটিল আদানপ্রদানের ও পার্থক্য রচনার সম্পর্ক আছে।

এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন তা খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলছেন যে পৃথিবীর বাকি অংশে জাতীয়তাবাদ যদি ইয়োরোপীয় মডেলকেই অনুসরণ করে, যদি তাদের ইম্যাজিনড কমিউনিটির কল্পনা ইয়োরোপ, আমেরিকাতেই সারা হয়ে গেছে, তাহলে উপনিবেশবাসীদের কল্পনা করবার বাকি রইল কী? ইতিহাস যেন আমাদের মতো উপনিবেশবাসীদের জন্য এই ডিক্রি জারি করে দিয়েছে যে আমরা চিরজীবন আধুনিকতার গ্রহীতা হয়েই থাকব। ইয়োরোপ ও আমেরিকাই ইতিহাসের প্রকৃত সাবজেক্ট, এরাই আমাদের হয়ে ভাবনাচিন্তা করে উপনিবেশে আলোকপ্রাপ্তির ও শোষণের স্ক্রিপ্টই

Scanned with OKEN Scanner